শ্রম আইন সংশোধন : ২০১৮

আইএলও-কে সন্তুষ্ট ও মালিকদের স্বার্থ রক্ষার কাজ একই সাথে করা হচ্ছে

'প্রস্তাবিত সড়ক পরিবহন আইন '১৮' শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ সংশোধনের দাবিতে ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি কার অটোটেম্পু, অটোরিক্সা ইউনিয়নের মিছিল

বাংলাদেশ এক অর্থে শ্রমিকের দেশ। দেশে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির পরিমাণ ৬ কোটি ৩৪ লাখ। পৃথিবীতে অন্তত, ১০০টি দেশ আছে যেসব দেশের জনসংখ্যা ৬ কোটির কম। শ্রমশক্তির পরিমাণ বিবেচনা করলে বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম শ্রম শক্তির দেশ। বাংলাদেশের এই শ্রমশক্তি কাজ করে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে। এ ছাড়াও এক কোটির বেশি শ্রমিক কাজ করে দেশের বাইরে। ১৬০টি দেশে কাজ করে তারা দেশে পাঠায় ১৪ বিলিয়ন ডলার। এক সময় কৃষি খাত ছিল বাংলাদেশের প্রধান খাত। ক্রমাগত শিল্পায়নের ফলে জিডিপিতে শিল্পের অবদান এবং দেশে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা দুটোই বাড়ছে। শ্রমিক কাজ করে জীবিকার জন্য। তার কাজ, মজুরি এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কিছু বিধিবিধান প্রয়োজন হয়, সরকার এই আইন এবং বিধি তৈরি করে থাকে। শ্রমিকদের অধিকারের আইনি স্বীকৃতি হলো শ্রম আইন। গণতান্ত্রিক আইন বলা যাবে তাকে, যে আইন কারো প্রতি বৈষম্য করবে না, যে আইন গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষা দেবে এবং যে আইনের চোখে সকলেই সমান বিবেচিত হবে।

২০০৬ সালে ভিন্ন ভিন্ন ২৫টি আইনকে একত্রিত করে শ্রম আইন ২০০৬ প্রবর্তন করা হয়। তখন শ্রমিক সংগঠনসমূহের মতামতের তোয়াক্কা না করে এমনকি সংসদে প্রয়োজনীয় আলোচনা না করে দ্রুততম সময়ে আইন পাস করানো হয়। শ্রমিকের সংজ্ঞা, চাকরিতে নিয়োগ, ছাঁটাই, বরখাস্ত, শাস্তি, কর্মসময়, ছুটি, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ ২১টি বিষয় নিয়ে ২১টি অধ্যায় এবং ৩৫৪টি ধারা সন্নিবেশিত হয়ে প্রবর্তিত হয়েছিল শ্রম আইন ২০০৬।

শ্রম আইন প্রবর্তনের পর থেকেই এর শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টসহ শ্রমিক সংগঠনসমূহ প্রতিবাদ করতে থাকে। শ্রমিক সংগঠনসমূহের দাবি ছিলো আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ যা বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে অনুসমর্থন করেছে, তার আলোকে স্বাধীনভাবে সংগঠন করা ও পছন্দমতো নেতা নির্বাচনের অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে। শ্রমিক সংগঠনসমূহের দাবি এবং আইএলও কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণের কারণে ২০১৩ সালে শ্রম আইন সংশোধিত হয়। কিন্তু সংশোধিত শ্রম আইনেও শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সম্প্রসারিত হয় নাই বরং নিপীড়নের নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এই সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠনসমূহ প্রতিবাদ জানাতে থাকে। 'তাজরিন' অগ্নিকাণ্ডে ১১২ জন শ্রমিক পুড়ে মৃত্যুবরণ ও রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ভবন ধসে ১ হাজার ১৩৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর ফলে শ্রমিকের অসহায়ত্ব, ট্রেড ইউনিয়নের অনুপস্থিতি, কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুবরণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, মালিকের কারণে শ্রমিকের মৃত্যু হলে শাস্তির দুর্বলতা, শ্রমিকদের প্রতি দমনমূলক আইন প্রভৃতি বিষয় জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। শ্রম আইন সংশোধনের প্রশ্নে শ্রমিক সংগঠনের দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে শ্রম আইনের প্রশ্নে আইএলও, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের পর্যবেক্ষণ ও মতামত জানায়। ফলে শ্রম আইনের পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। দফায় দফায় বৈঠক করে শ্রম আইন সংশোধনের লক্ষে মালিক, শ্রমিক, সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কমিটি দীর্ঘ আলোচনা করে কিছু বিষয়ে একমত হতে পেরেছে, কিছু বিষয়ে প্রচণ্ড বিরোধী অবস্থানে আছে এবং কিছু বিষয় সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়েছে এই ভেবে যে, সরকার সংবিধান, পূর্বের শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রীপরিষদে শ্রম আইন অনুমোদন করা হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে আগামী সংসদ অধিবেশনে সরকার সংশোধিত শ্রম আইন পাশ করবে।

২০০৬ এর শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন করার কোন বাধা না থাকলেও এমন শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিলো যার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন করা বা রক্ষা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দেশে ২ লাখের বেশি শিল্প ইউনিট থাকলেও ইউনিয়নের সংখ্যা এখনও ৮ হাজারেরও কম। ৬ কোটি ৩৪ লাখ শ্রম শক্তির মধ্যে মাত্র ২৮ লাখ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য। গার্মেন্টস এখন বাংলাদেশের প্রধান শিল্প খাত। ৪ হাজার ৫০০ এর মতো কারখানায় প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে গার্মেন্টস সেক্টরে। এই সেক্টরে ইউনিয়নের সংখ্যা ৬৬১। কিন্তু লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো গার্মেন্টসের এই সমস্ত ইউনিয়নগুলো কোন চার্টার অফ ডিমান্ড দিয়েছে কিনা জানা নেই। শ্রমিকের স্বার্থে মালিকপক্ষের সাথে দরকষাকষির জন্য ইউনিয়নের কোন ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, শ্রমিকের স্বার্থে কথা বলবে কি, এখন চাকরি রক্ষা করাই শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা ৩০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে ইউনিয়ন করার যে বিধান আইনের ১৭৯ ধারায় আছে তা আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর সাথে সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক। এ ছাড়া শ্রম আইনের ২৩ ধারা–অসদাচরণ এবং দণ্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শাস্তি, ২৬ ধারা–মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসান, ২৭–শ্রমিক কর্তৃক চাকরির অবসান, ১৮০ ধারা–ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা এই সমস্ত ধারা থাকার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা ও রক্ষা করা মালিকদের ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। শোনা যাচ্ছে শ্রম আইন সংশোধন করে কারখানাসমূহে শ্রমিক ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের পরিবর্তে ২০ শতাংশ শ্রমিক সদস্য থাকার বিধান করতে যাচ্ছে সরকার। শুনে মনে হবে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে এ এক বিশাল অগ্রগতি। কিন্তু শতাংশ কমলেও শ্রমিক ছাঁটাই এর ধারা এবং মালিকের ক্ষমতার কারণে ইউনিয়ন করা সহজ হবে না। পুঁজির ধর্ম অনুযায়ী বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে গ্রাস করে বৃহৎ পুঁজিতে পরিণত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। ছোট গার্মেন্টসকে গিলে ফেলে এমন বৃহৎ কিছু গার্মেন্টনস প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে ১০ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করে। এই সব মালিকদের পুঁজির ক্ষমতা, আইন না মানার ক্ষমতা দুটোই বেশি। কাজেই ২০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে ইউনিয়ন করতে হবে এই বিধান যদি প্রবর্তিত হয় তার পরও আইনের অন্যান্য ধারাগুলো বহাল থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন করা সহজ হবে না। যে শ্রমিক ইউনিয়ন করতে উদ্যোগী হবে সেই চাকরি হারানোর ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। মালিকরা এটা করে আসছে শ্রম আইনের ধারাগুলোকে কাজে লাগিয়েই। এখনও তার ব্যতিক্রম হবে না। আবার 'যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না সেখানে 'অংশগ্রহণকারী কমিটি' ট্রেড ইউনিয়নের মতো কাজ করতে পারবে' এই বাক্য সংযোজন করার ফলে ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে 'অংশগ্রহণকারী কমিটি' করতেই মালিকরা আগ্রহী হবে। মনে রাখা দরকার যে, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের সংগঠন কিন্তু 'অংশগ্রহণকারী কমিটি' মালিক-শ্রমিকের মিলিত সংগঠন। এর দ্বারা শ্রমিকের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কাজেই এই সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার আইএলও'র কাছে মুখ রক্ষা এবং মালিকদের মন রক্ষার কাজটি একই সাথে করলো।

এক দেশে একই বিষয়ে দুই বিধান এবং অধিকারের বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে। এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করা হচ্ছিল বেশ কিছুদিন থেকেই। নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে বৈষম্য শ্রম আইন ২০০৬-এ ছিলো। যেমন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের জন্য ৬ মাস এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৪ মাস এভাবেই ছুটির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিলো। এবারের সংশোধনের পরেও তার পরিবর্তন হবে না। বরং মাতৃত্বকালীন ছুটিকে মাতৃত্বকালীন অনুপস্থিতি হিসেবে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টসহ শ্রমিক সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কারণ অনুপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হলে নারী শ্রমিকের চাকরির ধারাবাহিকতা থাকবে না, চাকরির দৈর্ঘ্য কমে যাবে যা অন্যান্য অধিকারকে সংকুচিত করবে। ২০০৬ এর শ্রম আইনে মাতৃত্বকালীন ছুটি সন্তান প্রসবের পূর্বে ২ মাস এবং পরে ২ মাস এভাবে ভাগ করা হয়েছিলো। আমরা বলেছিলাম প্রসূতির শারীরিক অবস্থা এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছুটির সময় বণ্টন করা উচিত। কিন্তু তা গ্রহণ করা হয়নি। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি, নারী নিপীড়ন বন্ধে প্রস্তাবিত সংশোধনীতে কোন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও হার কী হবে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলছে। ২০০৬ ও ২০১৩ সালের আইনে কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত ছিল মাত্র ১ লাখ টাকা। শ্রমিক সংগঠনসমূহের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এটি সংশোধন করার। রানা প্লাজা ধসের পর হাই কোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটি সুপারিশ করেছিল কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ হবে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকদের ১৮৫৫ সালের আইন ফ্যাটাল অ্যাকসিডেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করাসহ আইএলও কনভেনশন ১২১- ২০১৩ সালের জুলাই মাসে গৃহীত ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা বিবেচনায় নেয়ার দাবি জানানো হয়েছিলো। এমনকি রানা প্লাজায় নিহত শ্রমিকদেরকে ১০ লাখ টাকা থেকে ৬৭ লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছিলো। অতীতের এই সব দৃষ্টান্ত থাকার পরও শ্রম আইনে কর্ম ক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ ২ লাখ টাকা এবং চিরস্থায়ী পঙ্গু হলে আড়াই লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন শ্রমিকের জীবনের দাম ২ লাখ টাকা! এটা শ্রমিক ও তার পরিবারের সাথে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিশুশ্রম বন্ধের কথা বললেও কিশোর শ্রমের ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে। আঠারো বছরের নিচে বয়স্কদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলে গণ্য করা হয়। ২০০৬ সালের শ্রম আইনে ১৮ বছরের নিচের অংশকে কিশোর আখ্যা দিয়ে তাদেরকে কর্মে নিযুক্ত করার বিধান ছিলো। এবারেও তা বহাল রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে ৩৪ লাখ শিশু কিশোর কাজে নিযুক্ত আছে বলে বিভিন্ন জরিপে উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে ১২ লাখ আছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। শিশু কিশোর শ্রমের মূল কারণ দারিদ্র্য, কিশোর শ্রমিক নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সস্তা শ্রম। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ পরিবহণ, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, ওয়ার্কশপ-গ্যারেজ, বাসাবাড়িতে শিশু কিশোররা কাজ করে। এত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির দেশে, সরকার ঘোষিত ১৫০ রকমের নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও সস্তা শ্রম হিসেবে কিশোরদের কাজ করানোর আইনি অনুমোদন রাষ্ট্রের বৈষম্যের দিকটি উন্মোচিত করলো।

এছাড়া আসদাচরণের নামে শ্রমিক হয়রানি, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সঠিকভাবে সংশোধনীতে আসেনি। বরং ওভার টাইমের নামে ১০ ঘণ্টা কর্মদিবস বানানোর কৌশলী ভূমিকা পালন করা হয়েছে।

শ্রম আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান লক্ষ্য আইএলও এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত চাপ মোকাবেলা করে মালিকদের স্বার্থ প্রধানত গার্মেন্টস মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। বিদেশি সংস্থাসমূহ শোভন কাজের কথা যতো বলে শোভন জীবনযাপনের জন্য ন্যায্য মজুরির কথা ততো বলে না। শ্রমিকের রক্ত মাখা পোশাক পরবে না বলে যতো মানবিক আবেদন প্রচার করে, শ্রমিকের ঘামের ন্যায্য দামের কথা ততো বলে না। শ্রমিক শোষণের ক্ষেত্রে দেশি মালিক এবং বিদেশি ক্রেতা একই মানসিকতা পোষণ করে। শ্রমিক শোষণের ব্যবস্থা কে সহযোগিতা করার নাম দেয়া হয় সুস্থ শিল্প সম্পর্ক। সরকার এর গ্যারান্টি দিয়ে আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করছে। সে কারণেই শ্রম সময়, কর্ম পরিবেশ, মজুরি নির্ধারণের মাপকাঠি,

মজুরি নির্ধারণের সময়সীমা সব কিছুই ২০০৬ এর অনুরূপ রাখা হবে বলে ধারণা করা যায়। মালিকের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপত্র হিসেবে এই শ্রম আইন ও তার সংশোধনীসমূহ কাজ করবে। মালিকদেরকে সন্তুষ্ট ও শ্রমিকদের শৃঙ্খলিত রাখার ক্ষেত্রে এই সংশোধনী অতীতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এর বিরোধিতা করাই হবে আমাদের কর্তব্য।